তারিখ ... 10 NOV 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ২ ...

কালের কণ্ঠ

ইসহাক খান ▷

সরকারি প্রাথমিক শিক্ষার মানে মহাদুর্গতি

সবচেয়ে বেদনার ব্যাপার হলো, সরকারের দেওয়া বই ভুলে ভরা। সরকার প্রতিবছর বিনা মূল্যে কোটি কোটি বই উপহার দেয় শিক্ষার্থীদের। বলা যায়, উদ্যোগটি মহৎ। কিন্তু সেই বই যদি শিক্ষার্থীদের সঠিক জ্ঞানের পরিবর্তে ভুল শিক্ষা প্রদান করে তাহলে ওই বই আমাদের কোমলমতি শিশুদের আসল শিক্ষা না দিয়ে মূর্খ হিসেবে গড়ে তুলছে। সেই প্রবাদবাক্যের মতো, এক মণ দুধের মধ্যে এক ফোঁটা চোনা দিলে যা হয়। পুরো দুধই নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি বইয়ে বানান ও বাক্য ভুলের জ্ঞান নিয়ে বেড়ে ওঠা আমাদের শিশুরা মূর্খ হিসেবে বেড়ে উঠছে। যারা এই পাঠ্য বই প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সেখানেও চলে বাণিজ্য

প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিক্ষার মূল। একটি শিশুকে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই শিক্ষায় নিজেকে প্রস্তুত করে ওই শিশু ধীরে ধীরে উচ্চতর শিক্ষায় নিজেকে নিয়োজিত করে। অথচ আমাদের শিক্ষার মূলেই গলদ। প্রাথমিকে যাঁরা শিক্ষা দেন তাঁদের বেশির ভাগই নিজেরা কিছু জানেন না। তাহলে তাঁরা শিশুদের কী শিক্ষা দেবেন? আমাদের শিশুরা কিছু না জেনে ওপরের ক্লাসে উঠছে। কেউ কেউ ওপরের ক্লাসে না উঠে ঝরে পড়ছে। অত্যন্ত অবহেলিত অবস্থায় রয়েছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা।

শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেছেন, 'শিক্ষার মানের উন্নতির প্রথম শর্ত হলো ভালো শিক্ষক। কিন্তু প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব রয়েছে। যাঁদের শিক্ষক হওয়ার কথা নয় তাঁরা অন্য কোনো চাকরি না পেয়ে প্রাথমিকে আসছেন। কিন্তু মাধ্যমিকের চেয়ে প্রাথমিকের শিক্ষকতা কঠিন। শিশুরা স্পর্শকাতর ও কোমলমতি। তাই প্রাথমিকের শিক্ষকদের দায়িত্বটা অনেক বেশি। প্রাথমিকের শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলে যেটা ছিল সেটাও এখন নেই। চাকরি পেলেই শিক্ষক হয়ে যান। শিক্ষকদের পুনঃপ্রশিক্ষণ হয় না, যা খুবই দরকার।'

অন্য একটি আলোচনায় প্রবীণ এই শিক্ষাবিদ বলেছেন, 'পানির স্তরের মতো শিক্ষার মান দ্রুত নিচের দিকে নামছে।' স্যারের এ কথাগুলোর চরম দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই 'কালের কণ্ঠে'। ৮ নভেম্বর কালের কণ্ঠ প্রথম পৃষ্ঠাজুড়ে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর একটি দলিল চিত্র তুলে ধরেছেন। সেখানে বিভিন্ন সাংবাদিক বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন অসংগতি নিয়ে লিখেছেন। তাতেই পরিষ্কার ফুটে উঠেছে প্রাথমিক শিক্ষার ওপর আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অযত্ন, অবহেলা, উদাসীনতা, দায়িত্বহীনতা, স্থবিরতা কতটা প্রকট।

পত্রিকায় শিক্ষাবিষয়ক লেখায় হতাশার প্রকাশ ঘটেছে এভাবে, 'রাজধানীর শেরেবাংলানগরে অবস্থিত আবুল বাশার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ২৭৩ জন। শিক্ষক ৯ জন। অর্থাৎ ৩০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। এমনিতে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গড়ে ৫২ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে একজন করে শিক্ষক। সে তুলনায় এ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর প্রতি শিক্ষকের সংখ্যা অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও গত বছর এ বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৪২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছে মাত্র একজন।

সাংবাদিক আরো লিখেছেন, সম্প্রতি এক দুপুরে আবুল বাশার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে মোট শিক্ষার্থীর এক-চতুর্থাংশ দেখা যায়নি। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, শিক্ষার্থীরা যে যার মতো আসছে, যাচ্ছে। শিক্ষকরাও কিছু বলছেন না। বিদ্যালয়ে রয়েছে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ল্যাপটপ। কিন্তু তা দিয়ে ক্লাস নেওয়ার মতো তথ্য-প্রযুক্তিতে দক্ষ কোনো শিক্ষক নেই। রাজধানীর প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এবং শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ছয় বা সাত কিলোমিটার দূরের একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র এটি।

শুধু আবুল বাশার প্রাথমিক বিদ্যালয় নয়, পুরো দেশেই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র একই রকম। ইউনেসকোর এশিয়া-প্যাসিফিক রিজিওনাল ব্যুরো ফর এডুকেশনের ২০১৫ সালের এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকের অভাবেই শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে না। প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার মাত্র ৫৮ শতাংশ। অথচ প্রতিবেশী দেশ নেপালে সরকারি প্রাথমিকে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের হার ৯০ শতাংশ। পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কায় ৮২ শতাংশ। মালদ্বীপে ৭৮ শতাংশ আর মিয়ানমারে শতভাগ শিক্ষকই প্রশিক্ষিত।

এই সাংবাদিক একটি মজার ঘটনা তুলে ধরেছেন তাঁর প্রতিবেদনে। ঘটনাটা মজার না, বেদনার। কিন্তু আমরা মজা হিসেবে দেখতেই অভ্যস্ত। গত এপ্রিলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য যাচ্ছিলেন। পথে মহেশপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে শিক্ষার্থীদের ভিড় দেখে মন্ত্রী তাঁর গাড়ি থামিয়ে বিদ্যালয়ে যান। তখন সকাল ১১টা ৪০ মিনিট। অথচ কোনো শিক্ষক তখনো বিদ্যালয়ে উপস্থিত হননি। শ্রেণিকক্ষগুলো ছিল বন্ধ। শিক্ষকদের অপেক্ষায় ছিল শিক্ষার্থীরা। এ অবস্থায় মন্ত্রী উপজেলা ভারপ্রাপ্ত শিক্ষা কর্মকর্তাকে ফোন করেন। এরও ১০ মিনিট পর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ে উপস্থিত হন। তখনো অনুপস্থিত ছিলেন দুই সহকারী শিক্ষক। এ সময় মন্ত্রী প্রধান শিক্ষককে ভর্ৎসনা করে নিজেই ক্লাস নেন।

এ ঘটনার পর ওই বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোনো শাস্তি হয়েছে, না পুরস্কার দেওয়া হয়েছে প্রতিবেদনে তার ফলোআপ করেননি সাংবাদিক।

সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র একই। অনেক শিক্ষক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চাকরিকে দ্বিতীয় পেশা হিসেবে মনে করেন। তাঁরা বিদ্যালয়ে আসতে ও শিক্ষার্থীদের পাঠদানে আন্তরিক নন। শিক্ষা কর্মকর্তারাও নানা অনিয়মে জড়িত। আমাদের দেশে সরষের মধ্যেই বেশি ভূত। এ জন্য ভূত আর তাড়ানো যাচ্ছে না।

আমার গ্রামের বাড়িতে বাড়ি-লাগোয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। আমিও ওই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষা নিয়ে উচ্চতর শ্রেণিতে উঠেছি। বাড়ি গেলে আমি প্রায়ই স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠদান দেখি। কখনো আমি নিজেও পাঠদান করি। আমি দেখেছি, শিক্ষকরা কখনো সময়মতো স্কুলে আসেন না। এলেও তাঁরা অন্যান্য পারিবারিক সমস্যা নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেউ কেউ ক্লাসে ছাত্রদের অঙ্ক করতে দিয়ে টেবিলে মাথা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। এমন দৃশ্য আমি অনেকবার দেখেছি। দু-একজন শিক্ষককে আমি লজ্জাও দিয়েছি।

শত শত স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি। আবার যেসব স্কুলে প্রধান শিক্ষক রয়েছেন তাঁরা ঠিকমতো স্কুলে আসেন না। তাঁদের দেরি করে স্কুলে আসা নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন না। স্কুল কমিটি কিংবা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রশ্ন তুলতে পারেন। সে ক্ষমতা তাঁদের আছে। কিন্তু তাঁরা প্রশ্ন তোলেন না। তুললেই তাঁদের থামিয়ে দেওয়ার কৌশল তাঁরা ভালো করেই জানেন। অথচ শিক্ষার মান বাড়াতে তদারকির দায়িত্ব যাঁদের হাতে, সেই প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তারাই জড়িয়ে পড়েছেন নানা অনিয়মে। পরিদর্শনব্যবস্থা একেবারেই নড়বড়ে। টাকা দিলেই ম্যানেজ হয়ে যায়।

সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীতে ফল জালিয়াতির সঙ্গেও শিক্ষা কর্মকর্তাদের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। রাজধানীর মিরপুরে সাতটি বিদ্যালয়ে কয়েক বছর ধরেই টাকার বিনিময়ে ফল পরিবর্তন করা হচ্ছে। আর এ কাজে স্বয়ং উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাই সহায়তা করেছেন। গত মাসে ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ের উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ঘুষের টাকাসহ গ্রেপ্তার হয়েছেন। গত মে মাসে সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ঘুষের টাকা না পেয়ে ডায়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের মাথা ফাটিয়ে দেন।

সবচেয়ে বেদনার ব্যাপার হলো, সরকারের দেওয়া বই ভুলে ভরা। সরকার প্রতিবছর বিনা মূল্যে কোটি কোটি বই উপহার দেয় শিক্ষার্থীদের। বলা যায়, উদ্যোগটি মহৎ। কিন্তু সেই বই যদি শিক্ষার্থীদের সঠিক জ্ঞানের পরিবর্তে ভুল শিক্ষা প্রদান করে তাহলে ওই বই আমাদের কোমলমতি শিশুদের আসল শিক্ষা না দিয়ে মূর্খ হিসেবে গড়ে তুলছে। সেই প্রবাদবাক্যের মতো, এক মণ দুধের মধ্যে এক ফোঁটা চোনা দিলে যা হয়। পুরো দুধই নষ্ট হয়ে যায়। তেমনি বইয়ে বানান ও বাক্য ভুলের জ্ঞান নিয়ে বেড়ে ওঠা আমাদের শিশুরা মূর্খ হিসেবে বেড়ে উঠছে। যারা এই পাঠ্য বই প্রকাশের সঙ্গে জড়িত সেখানেও চলে বাণিজ্য। এই বাণিজ্য আমাদের সব কিছু গ্রাস করে ফেলছে। তবে শিক্ষায় বাণিজ্য সবচেয়ে বড় ক্ষতি করছে আমাদের।

নতুন এক ধারা তৈরি হয়েছে—সৃজনশীল পদ্ধতি। অথচ ১৩ শতাংশ শিক্ষক একেবারেই বোঝেন না সৃজনশীল পদ্ধতি কী? ৪২ শতাংশ শিক্ষক বুঝলেও ক্লাসে তাঁরা বোঝাতে পারেন না। ৪৭ শতাংশ শিক্ষক গাইড বই ফলো করেন বোঝার জন্য। অথচ কিছু না বুঝেই চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে সৃজনশীল পদ্ধতি। রয়েছে শিক্ষকের ঘাটতি। যে দেশে লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার, সেখানে শিক্ষকের ঘাটতির ব্যাপারটা সরকারের উদাসীনতার চূড়ান্ত ফল।

লেখক : গল্পকার, টিভি নাট্যকার